শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

ভ্রাজিষ্ণুর্ভোজনং ভোক্তা সহিষ্ণুর্জগদাদিজঃ।
অনঘো বিজয়ো জেতা বিশ্বযোনিঃ পুনর্বসুঃ॥২৯

শাংকরভাষ্য : প্রকাশৈকরসত্বাদ্ ভ্রাজিষ্ণুঃ। ভোজ্যরূপক্ষ্মতয়া প্রকৃতির্মায়া ভোজনম্ ইত্যুচ্যতে। পুরুষরূপেণ তাং ভুঙ্‌ক্তে ইতি ভোক্তা। হিরণ্যাক্ষাদীন্ সহতে অভি-ভবতীতি সহিষ্ণুঃ। হিরণ্যগর্ভরূপেণ জগদাদাবুৎপদ্যতে স্বয়মিতি জগদাদিজঃ। অঘং ন বিদ্যতেঽস্যেতি অনঘঃ 'অপহতপাপ্মা' (ছান্দোগ্য ৮।৭।১) ইতি শ্রুতেঃ। বিজয়তে জ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্যাদিভির্গুণৈর্বিশ্বমিতি বিজয়ঃ। যতো জয়ত্যতিশেতে সর্বভূতানি স্বভাবতোঽতো জেতা। বিশ্বং যোনির্যস্য বিশ্বশ্চাসৌ যোনিশ্চেতি বা বিশ্বযোনিঃ। পুনঃ পুনঃ শরীরেষু বসতি ক্ষেত্রজ্ঞরূপেণেতি পুনর্বসুঃ॥

ভাবানুবাদ : প্রাকৃত এই জড়জীবনের অন্তরালে অপ্রাকৃত এক জ্যোতির্ময় সত্তার উপস্থিতির কথা উপনিষদ আমাদের বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন (শ্বেতাশ্বতর ৩।৮)—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

—অন্ধকারের পারে সূর্যের মতো এক উজ্জ্বল পুরুষের কথা আমি জানি, তাঁকে উপলব্ধি করাই মৃত্যুকে অতিক্রম করার একমাত্র পথ, আর অন্য কোনও পথ নেই। পুরুষসূক্তেও একই ভাষায় তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে।

পিতামহ ভীষ্মের কণ্ঠেও তাঁর জ্যোতির্ময় সত্তার অনুধ্যায়ী সম্বোধন—'ভ্রাজিষ্ণু'। ভ্রাজ্ ধাতু ব্যবহৃত হয় দীপ্যমান অর্থে। ভাষ্যকার বলছেন, সর্বত্র সমান ঔজ্জ্বল্য তাঁর। উপনিষদের ভাষাতেই যেন পিতামহ ভীষ্ম শ্রীভগবানের জ্যোতির্ঘন সত্তার কথা যুধিষ্ঠিরকে শোনাচ্ছেন।

শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিকেই অন্ধকারাত্মক বস্তুতত্ত্ব বলা যায়। অপরা প্রকৃতির অধীন মনের অবিদ্যাই অন্ধকার। তিনগুণের পারে আছে সেই আলোর ঠিকানা। মুণ্ডক উপনিষদে পাই (২।২।৯),

"হিরণ্ময়ে পরে কোশে
বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতি-
স্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥"

—অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে জ্যোতির জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মকে আত্মজ্ঞানীরা উপলব্ধি করেছেন।

সেই আলোকের উদ্ভাস বা চৈতন্যসত্তার জাগরণ অবিদ্যার অন্ধকারকে যেন গ্রাস করে নেয়। ভাষ্যকার বলছেন, ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি বা মায়াই ভোজ্য। ভোক্তা ভগবান। তিনিই এই প্রকৃতিকে ভক্ষণ করেন, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি ঈশ্বরেই বিলীন হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্‌কালে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ অর্জুনের এমনই এক দর্শন হয়েছিল। অর্জুন দেখেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বিরাটরূপের বিকট দন্তবিশিষ্ট মুখবিবরে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ যোদ্ধা প্রবিষ্ট হচ্ছেন, তাঁদের চূর্ণ-বিচূর্ণ মস্তক ভগবানের দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে আটকে আছে—

"বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥"

(গীতা ১১।২৭)

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের একটি ঘটনার কথা এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে। একজন বিবাহের পর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে তাঁর পায়ে ধরে ব্যাকুলভাবে জানালেন, স্ত্রীকে ভালবাসতে ইচ্ছে হচ্ছে—এই তো মায়া!! শুনে অন্তর্যামী ঠাকুর বলেছিলেন, "তুই একদিন কিছু মিষ্টি নিয়ে আসিস, তোর মায়াটা খেয়ে দেব।"

অথচ ভগবানের এই ভয়ংকর রূপের মধ্যেও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের কোনও অসংযত প্রকাশ নেই। নেই কোনও প্রগলভ স্বেচ্ছাচার। জগৎ জুড়ে এই ব্যাপক কর্মপ্রবাহ তাঁরই চরণনিঃসৃত—"যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী' (গীতা ১৫।৪), অথচ প্রত্যেক জীবের প্রাণের মধ্যে নিরন্তর কাজ করে চলেছে ইচ্ছাশক্তির স্বতন্ত্রতা। জীবের মনে প্রশ্ন ওঠে—"কে-ই বা খেলায়, কেনই বা খেলি?" "কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ, কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ" (কেনোপনিষদ।১।১)—কার নির্দেশে চলে আমাদের প্রাণমন? শ্বেতাশ্বতর উপনিষদও সুন্দরভাষায় বলেছেন,

"স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি
কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্॥" (৬।১)

—কোনও কোনও জ্ঞানী-র মতে, স্বাভাবিকভাবেই (আকস্মিকভাবে) এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে, অন্যেরা কেউ কেউ ভাবেন কালই এই সৃষ্টির কারণ। তাঁরা বিভ্রান্ত, পরিমুহ্যমান। এটিই মায়া। এটি ঈশ্বরেরই মহিমা, তাঁরা জানেন না এই সৃষ্টিচক্র তাঁরই দ্বারা আবর্তিত হচ্ছে।

জগতের অন্তরালে এই বিশাল অন্তহীন শক্তি এক নিবিড় রহস্যে ঢাকা। এর থেকে বড় সহিষ্ণুতা, নীরবতা, আত্মবিলুপ্তির কোনও দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে নেই।

পিতামহ একে বলছেন সহিষ্ণুতা। ভাষ্যকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন হিরণ্যাক্ষের। বৈকুণ্ঠে নারায়ণের দ্বারী ছিলেন জয়-বিজয়। দম্ভ থেকে তাঁদের পতন। কশ্যপ মুনির ঔরসে দিতির গর্ভে তাঁরা জন্ম নিলেন। তাঁদেরই একজন হিরণ্যাক্ষ। দানবরূপে ভয়ংকর হয়ে উঠেছিলেন তিনি। পৃথিবীমাতাকে (ভূদেবী) হরণ করে পাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। বরাহ-দেহে বিষ্ণু অবতীর্ণ হয়ে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন এবং ভূদেবীকে উদ্ধার করে আনেন। বহু আসুরিক প্রবৃত্তি, বহু অত্যাচার তিনি নীরবে সহ্য করে থাকেন। তাঁর ধৈর্যের সীমা নেই। পিতামহ যেন যুধিষ্ঠিরকে বলতে চাইছেন, নারায়ণের এই ক্রিয়াদক্ষতা, এই কর্তৃত্ব ইন্দ্রাদি দশদিকপালের মতো অর্জিত বা আরোপিত নয়। এই কর্তৃত্ব তাঁর সহজাত। তিনিই সৃষ্টির আদিপুরুষ—জগতের আদিতে বা প্রারম্ভেই তিনি জাত—'জগদাদিজ'।

আমরা শঙ্কর তাঁর গীতাভাষ্যের প্রারম্ভে লিখেছেন,

"নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্।
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী॥"

—নারায়ণ অব্যক্ত মূলপ্রকৃতির অতীত। অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে ব্রহ্মাণ্ড সমুৎপন্ন। এই ব্রহ্মাণ্ডেই বিদ্যমান সপ্তদ্বীপা পৃথিবী। টীকাকার আনন্দগিরি অর্থ করেছেন, অব্যক্ত থেকে অপঞ্চীকৃত ভূতাত্মক সমষ্টিসূক্ষ্মশরীর অভিমানী হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি। হিরণ্যগর্ভের থেকে সমষ্টিস্থূলশরীর অভিমানী বিরাটের উৎপত্তি। অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ, এবং অনন্ত পিণ্ডাত্মস্বরূপ জীবসমষ্টি—অব্যক্তজাত এই দ্বিবিধ বস্তুর যিনি অধিষ্ঠান, অয়ন বা আশ্রয় তিনিই নারায়ণ।

পুরুষসূক্তেও অনুরূপ বলা হয়েছে—"তস্মাদ্বিরাড়জায়ত। বিরাজো অধিপুরুষঃ। স জাতো অত্যরিচ্যত। পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ।" (মন্ত্র ৫)—সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ থেকেই ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীর উৎপন্ন হল। সমষ্টিশরীরের অভিমানী পুরুষ—হিরণ্যগর্ভ, বিরাট এইভাবেই জাত হলেন। তারপর ভূমি প্রভৃতি স্থূল পঞ্চভূত। তাই তিনিই আদিপুরুষ—"তৎপুরুষস্য বিশ্বমাজানমগ্রে" (তদেব, মন্ত্র ১৯)।

গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—আমাকে এভাবে অনুধ্যান করবে—

"কবিং পুরাণম্ অনুশাসিতারম্...
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।" (৮।৯)

'তমসঃ পরস্তাৎ'—অবিদ্যার অন্ধকারের পারের সেই ত্রিগুণাতীত পুরুষকে পৃথিবীর কোনও পাপ স্পর্শ করতে পারে না, তিনি 'অনঘঃ'। ভাষ্যকার ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, 'য আত্মাঽপহতপাপ্মা (৮।৭।১)।' উপনিষদের মন্ত্রের অনুধ্যানের মাধ্যমে ভাষ্যকার যেন বলতে চাইছেন একটি সাধনসূত্র—'সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ' (তদেব ৮।৯)—নিষ্পাপ এক শুদ্ধ সত্তাই জীবনের স্বরূপ, সেই সত্যের অনুসন্ধান জীবনের উদ্দেশ্য। সমস্ত শক্তির উৎস তিনি, সর্বত্রই তাঁর জয়। পিতামহ ভীষ্ম তাঁকে সম্বোধন করছেন বিজয়, জেতা নামের উল্লেখে। ভাষ্যকার ইঙ্গিত দিয়েছেন, ষড়ৈশ্বর্যের দ্বারা বিশ্বকে জয় করেন—অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্যে বিশ্বের সকলকে অতিক্রম করেন বলে তাঁর নাম 'বিজয়'। গীতার অবতরণভাষ্যে ভাষ্যকার লিখেছেন, "স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য-শক্তি-বলবীর্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নঃ..." ইত্যাদি।

জেতা শব্দের অর্থও একই—জয়ী। প্রাণীমাত্রকে স্বভাবতই তিনি জয় করে আছেন। শ্রীরাম অবতারে সমস্ত প্রতিকূলতা তিনি জয় করে নিয়েছেন অনায়াসে, অন্যের কল্যাণের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ অবতারে বৃন্দাবনলীলায় তাঁর প্রথম বিজয়টিই বড় অদ্ভুত। রাক্ষসী পুতনাকে কংস পাঠিয়েছেন ব্রজের শিশুটিকে বধ করার জন্য। বাৎসল্যরসের প্রতিমা হয়ে মাতৃরূপিণী পুতনা যখন নন্দগৃহে প্রবেশ করছেন, শিশুটি তখন বিছানায় শুয়ে। আদর করার ভঙ্গিতে পুতনা তাঁকে কোলে তুলে নিলেন—'আরোপয়দঙ্কম্'। ভাগবতকার শুকদেব একটি অসাধারণ উপমা প্রয়োগ করেছেন এখানে—নির্বোধ যেমন নিদ্রিত সাপকে রজ্জুবোধে তুলে নেয়—'যথোরগং সুপ্তমবুদ্ধিরজ্জুধীঃ' (১০।৬।৮)—সেভাবেই পুতনা শিশুটিকে কোলে নিয়ে তার মুখে দিলেন বিষমাখা স্তন্য। পরক্ষণেই তিনি বুঝতে পারলেন, প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে সেই মরণদংশনে—মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন। বেরিয়ে পড়ল তাঁর স্বরূপ—তাঁর ভীষণদর্শন রাক্ষসীদেহটি। কী অদ্ভুত প্রয়োগকৌশল—যে-মাতৃভাব নিয়ে পুতনা এসেছিলেন, সেই ভাবকে অবিকৃত রেখেই তাঁকে বধ করলেন ভগবান।

পুতনার গগনভেদী চিৎকারে ব্রজের গোপীরা এসে ভিড় করেছেন, দেখছেন তখনও সেই নিষ্প্রাণ ভয়ংকর দেহটির উপর শুয়ে শিশুটি খেলা

করছে—'বালঞ্চ তস্যা উরসি ক্রীড়ন্তমকুতোভয়ম্' (১০।৬।১৮)।

রাক্ষসীর দেহ সৎকারের সময় তাঁর দেহ থেকে অগুরুর মতো সুগন্ধি ধূম নির্গত হয়েছিল। কারণ শ্রীকৃষ্ণের স্তন্যপানে তাঁর সমস্ত পাপ নষ্ট হয়েছিল। অভিনব তাঁর দানবদলন, অভিনব তাঁর জয়।

সৃষ্টির সমস্ত পাপ তিনিই দহন করতে পারেন, কারণ সৃষ্টি তাঁরই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্' (১৪।৩)—সমস্ত জগতের কারণরূপা অব্যক্ত মূলপ্রকৃতি আমার যোনি, তাতে আমি জীবরূপ গর্ভ স্থাপনা করি। বিশ্ব যাঁর যোনিস্বরূপ তিনিই 'বিশ্বযোনি'। ভাষ্যকার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও এর অর্থ করেছেন কর্মধারয় সমাস করে, যিনি বিশ্ব তিনিই যোনি—দুই-ই তিনি। পরিশেষে পিতামহ যুধিষ্ঠিরকে জানাচ্ছেন, তত্ত্বত এবং বাহ্যত তিনি পুনঃ পুনঃ এই সৃষ্টিতেই নিবাস করেন। তাই তিনি পুনর্বসু।

গীতায় ভগবান বলছেন (১৩।২-৩), সমস্ত ক্ষেত্রের অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্মাদি শরীরের যিনি জ্ঞাতা, তিনিই আমি। কোনও কোনও গবেষক অন্য অর্থও করেছেন। সৃষ্টির ভার হরণ করতে পুনঃ পুনঃ তিনি শরীর ধারণ করেন। সেইসব অবতারদেহ তাঁর বসতি হয়ে ওঠে, সে-অর্থেও তিনি পুনর্বসু—তত্ত্বত এবং বাহ্যত। *(ক্রমশ)*

লেখকের প্রতি

* নিবোধত পত্রিকার জন্য যে-লেখাটি পাঠাতে চলেছেন তার একটি নকল অবশ্যই নিজের কাছে রাখবেন। **আমরা কোনও পাণ্ডুলিপি (মনোনীত বা অমনোনীত) ফেরত দিই না।**
* আপনার পাঠানো প্রবন্ধের সঙ্গে নিজের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং ইমেল (থাকলে)-এর উল্লেখ অবশ্যই করবেন।
* আগে কোথাও ছাপা হয়েছে এমন লেখা পাঠাবেন না।
* শুধু ধর্মীয় প্রসঙ্গ নয়—দর্শন, ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য, বরেণ্য সাধক ও মহাপুরুষদের কথা নিয়ে ইতিবাচক লেখা আমরা প্রকাশ করি।
* আপনার লেখা ১৫০০ থেকে ২০০০ শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
* ধারাবাহিক রচনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাঠাতে হবে।
* লেখা পাওয়ার পর সবসময় পত্রে প্রাপ্তিস্বীকার করা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে আপনারাই লেখাটি পত্রিকার সম্পাদনাবিভাগে পৌঁছেছে কি না ফোন করে জেনে নেবেন। প্রবন্ধ বা কবিতা মনোনীত হলে যথাসময় প্রকাশিত হবে। আপনার প্রবন্ধটি অমনোনীত বলে আমাদের সম্পাদনা দপ্তর থেকে না জেনে নিয়ে শুধুমাত্র প্রকাশে বিলম্ব হতে দেখে অন্য পত্রিকায় একই লেখা দেবেন না। নানা কারণে মনোনীত প্রবন্ধ প্রকাশেও বিলম্ব ঘটতে পারে।
* সমালোচনার জন্য দুটি বই পাঠাবেন। কবিতা বা গানের বইয়ের সমালোচনা হয় না।
* লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র, ফোটো থাকলে তা ফিরিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব আপনারই।
* প্রবন্ধের সঙ্গে তথ্যসূত্র দিলে নিম্নোক্ত ক্রম অনুসরণ করুন :
লেখকের নাম, বইয়ের নাম, প্রকাশনা সংস্থার নাম, প্রকাশের স্থান ও বর্ষ, খণ্ড বা ভাগ (যদি থাকে) এবং পৃষ্ঠা